# একশো গানের মর্মকথা

সুধীর চক্রবর্তী

পুনশ্চ

# আত্মপক্ষ

২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত টানা দু'বছর 'আজকাল' পত্রিকার 'রবিবাসর' ক্রোড়পত্রে 'গানমেলা' শীর্ষনামে ১০০টি গানের রচনা বৃত্তান্ত, সুরবৈশিষ্ট আর প্রকাশতথ্য প্রকাশিত হয়ে শ্রোতাদের আনন্দিত আর প্রত্যাশাপূরণের তৃপ্তির জোগান দেয়। প্রখ্যাত প্রকাশক 'প্রতিভাস'-এর কর্ণধার শ্রীমান বীজেশ সাহা আগ্রহ করে লেখাগুলি বিন্যস্ত করে এবং বর্ণরঙিন সজ্জায় সাজিয়ে ২০১৭ সালের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশ করে। সংকলনটির নাম দেওয়া হয় 'শত গানের গানমেলা'। বইটি অনেকের পছন্দসই হয় এবং বিপণনগত সফলতা পায়। ভেবেছিলাম ১০০টি গানের নতুন ধরনের এই ধারাবাহিক প্রকাশনার অন্তে আমি ছুটি পাব। কিন্তু 'আজকাল' পত্রিকার 'রবিবাসর' ক্রোড়পত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শৌনক লাহিড়ী আমাকে বলেন কলমটি চালিয়ে যেতে। আমি রাজি হই, তবে শিরোনাম বদলে লেখাগুলির নাম দিই 'গানের ঝাঁপি'। দু'বছর ধরে আরও একশোটি গান নিয়ে লেখা চলে। সেই কাজ সাঙ্গ হলে আমার স্নেহভাজন প্রকাশক শ্রীমান সন্দীপ নায়েক তাঁদের খ্যাতকীর্তি প্রকাশনা 'পুনশ্চ'-র পক্ষ থেকে '১০০টি গানের ঝাঁপি' বই আকারে ছাপতে চায়। আমি রাজি হই। 'পুনশ্চ' ইতিপূর্বে আমার 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রকাশ করেছেন।

এইভাবে আপাতত সংক্ষেপে জানানো গেল শতগানের ঝাঁপি কীভাবে বর্তমান প্রকাশিত রূপ পেল। এই সংকলনটি প্রস্তুত করবার সময় পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় সামান্য পরিমার্জনা ঘটানো হয়েছে। এতে যথাক্রমে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গান পরপর বিন্যস্ত করা হয়েছে। গানগুলি প্রকাশের সুনিশ্চিত তথ্য ও বাস্তব সময়কাল পাওয়া যায়নি বলে বিন্যাসের সময় কালক্রম মানা যায়নি—বিকল্পে আলোচ্য গানের প্রথম পংক্তির বর্ণানুসারে সাজানো সংগত মনে হয়েছে। এমন শ্রমসাধ্য কাজে আনন্দ কিছু কম ছিল না। গানগুলি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা রইল। আশাকরি 'গানমেলা'-র মতো 'গানের ঝাঁপি'ও সমজদারি তথা বিপণনভাগ্য পাবে। বইটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক সন্দীপ নায়েককে আশীর্বাদ জানাই। বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন স্নেহাস্পদ কিশলয় ব্রহ্ম, প্রুফ সংশোধনের কঠিন দায়িত্বভার ছিল তার ওপরে।

সুধীর চক্রবর্তী

৮, রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর ৭৪১১০১
যোগাযোগ : ৯৪৭৫১১৩৬০২

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম | ১১ |
| আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে | ১৩ |
| আমরা নূতন যৌবনেরই দূত | ১৫ |
| আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব | ১৭ |
| আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল | ১৯ |
| আমায় একটু জায়গা দাও | ২২ |
| আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে | ২৪ |
| আমার বলার কিছু ছিল না | ২৬ |
| আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে | ২৮ |
| আমারে ভেঙে ভেঙে নাথ | ৩০ |
| আমি দেখলাম এ সংসার ভোজবাজির কারবার | ৩২ |
| আমি নই, আমার ভিতর ওই | ৩৫ |
| আমি বৃষ্টি দেখেছি | ৩৮ |
| আমি যদি পিঠে তোর ওই | ৪১ |
| আমি শান্তিপ্রিয় লোক | ৪৩ |
| আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি | ৪৫ |
| আয় খুকু আয় | ৪৭ |
| এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনই | ৪৯ |
| এ যদি আকাশ হয় | ৫১ |
| এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে | ৫৩ |
| এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায় | ৫৫ |
| এই পথ যদি না শেষ হয় | ৫৮ |
| একটা আজগুবি এক কথা শুনে | ৬০ |
| এখনও সারেঙ্গিটা বাজছে | ৬২ |
| এবার আমার সময় হল | ৬৪ |
| এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না | ৬৬ |
| এমন বন্ধু আর কে আছে | ৬৮ |
| এমনও দিন আসতে পারে | ৭০ |
| ও তোতা পাখি রে | ৭৩ |

| | |
|---|---|
| ও পলাশ বনের মুকুল | ৭৫ |
| ওই কোকিল শোনায় চৈতি হাওয়ার | ৭৭ |
| ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ | ৭৯ |
| কতটা পথ পেরোলে তবে | ৮১ |
| কবে আছি কবে নেই | ৮৩ |
| কবে তুমি আসিবে মোর আঙিনায় | ৮৫ |
| কারার ওই লৌহকপাট | ৮৮ |
| কী ঠাকুর দেখলাম চাচা | ৯০ |
| কে জাগে? কে জাগে? | ৯২ |
| কে প্রথম কাছে এসেছি? | ৯৪ |
| গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না | ৯৬ |
| গাড়ি চলে না চলে না | ৯৮ |
| গিন্নির ভাই পালিয়ে গিয়েছে | ১০০ |
| গিরিবর, আর পারিনে হে | ১০২ |
| গোঁসাই যে ভাবেতে যখন রাখো | ১০৫ |
| ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী | ১০৭ |
| ছুঁতে ছুঁতে কতো আকাশ ডানায় ডানায় | ১০৯ |
| জালালের এই ছন্নছাড়া বেহিসেবি জীবনধারা | ১১১ |
| ঠিকানা না রেখে | ১১৩ |
| তখন তোমার একুশ বছর বোধহয় | ১১৫ |
| তিনি বৃদ্ধ হলেন | ১১৭ |
| তুমি বলেছিলে কোনো মনের মুক্তো | ১১৯ |
| ত্রিনয়নী দুর্গা | ১২১ |
| দিরাই থানায় বসত করি | ১২৩ |
| দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো | ১২৫ |
| দূরের মানুষ কাছে এসো | ১২৭ |
| দে দোল দোল দোল | ১২৯ |
| দোল দোল চতুর্দোলায় চড়ে | ১৩১ |
| নয়নে তার ভোমরা কাজল কালো | ১৩৩ |
| নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে | ১৩৫ |
| নিশীথে যাইও রে ফুলবনে | ১৩৭ |
| পাখিদের ওই পাঠশালাতে | ১৩৯ |
| প্রতিধ্বনি শুনি আমি | ১৪১ |
| প্রভাতে যারে নন্দে পাখি | ১৪৪ |
| বর্ণচোরা ঠাকুর এলো | ১৪৬ |
| বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ | ১৪৮ |

| | |
|---|---|
| বাংলা! জনম দিলা আমারে | ১৫০ |
| বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল | ১৫২ |
| বুড়োবুড়ি দুজনাতে | ১৫৪ |
| ভালো করে পড়গা ইস্কুলে | ১৫৬ |
| মধুর আমার মায়ের হাসি | ১৫৮ |
| মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে | ১৬০ |
| মন তোর এত ভাবনা কেনে | ১৬২ |
| মা মাগো মা, অন্য কিছু গল্প বলো | ১৬৪ |
| মানুষেতে মানুষ আছে | ১৬৬ |
| মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে | ১৬৮ |
| যখন এসেছিলে অন্ধকারে | ১৭১ |
| যদি কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত | ১৭৩ |
| যদি বন্ধু হও তবে বাড়াও হাত | ১৭৫ |
| যেথায় থাকে সবার অধম | ১৭৭ |
| শরীরটারই ভিতরে পরান | ১৭৯ |
| শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি | ১৮১ |
| শাল কাঁদে পিয়াল কাঁদে | ১৮৩ |
| শোনো, একটি মুজিবরের থেকে | ১৮৫ |
| সে আমার ছোটো বোন | ১৮৭ |
| সে ডাকে আমারে | ১৮৯ |
| সেই যে দিনগুলি বাঁশি বাজানো দিনগুলি | ১৯২ |
| সারাদিন তোমায় ভেবে | ১৯৪ |
| স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল | ১৯৬ |
| হয়তো তাকে দেখেনি কেউ | ১৯৯ |
| হো দোলা, হে দোলা | ২০২ |
| হে নূতন দেখা দিক আর-বার | ২০৪ |
| আ চলকে তুঝে ম্যায় লে কে চলুঁ | ২০৬ |
| জিস গলি মে তেরা ঘর না হো | ২০৮ |
| মা মেরি মা, প্যারি মা | ২১০ |
| মোহ মোহ কে ধাগে | ২১২ |
| যশোমতী মাইয়া সে বোলে নন্দলালা | ২১৫ |
| যানেবালে সিপাহিসে পুছো | ২১৭ |
| Bangladesh, Bangladesh | ২১৯ |
| Down the way where the nights are gay | ২২১ |
| Have no fear this career | ২২৩ |

## ॥ আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম ॥

বাংলা বেসিক গানের ওপর নির্ভর করে কোনও কোনও গায়ক বা গায়িকা তাঁদের নিজস্ব গীতিময় জগৎ নির্মাণ করেছেন এবং গায়ন স্বাতন্ত্র্যে ও কণ্ঠবাদনের দক্ষতায় আপন প্রতিষ্ঠাবেদি রচনা করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। একথা বলবার মানে, সবচেয়ে নজরকাড়া গণমাধ্যম যেটি অর্থাৎ বাংলা সিনেমাজগৎ, তাতে তাঁদের ততটা আহ্বান বা সমাদর ঘটেনি, অথচ হয়তো অনেকটা কম প্রতিভা বা চর্চা না থাকলেও কেউ স্রেফ একটা বা দুটো ফিল্মে গান গেয়ে অনেক বেশি উল্লেখ এবং সমঝদারি পেয়ে গেছেন। যেমন ধরা যাক, বেশ মনে আছে, সুজাতা চক্রবর্তী নামের একজন গায়িকা 'অতল জলের আহ্বান' ফিল্মের একখানি গান গেয়েছিলেন। গানটা হল :

ভুল সবই ভুল—
এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা—
সে ভুল।
এই শ্রাবণে মোর ফাগুন যদি দেয় দেখা—
সে ভুল।

গানটি লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কী এমন আহামরি গান কে বলবে? অথচ রাতারাতি সকলের পছন্দ হয়ে গেল। রেকর্ড বেশ ভালো পরিমাণে বিক্রি হল। রেডিওতেও শোনা গেল। সুজাতা চক্রবর্তীর নাম প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। কিন্তু তারপর কোথায় কী? কে যে সেই সুজাতা চক্রবর্তী, কী যে তাঁর সাংগীতিক পশ্চাৎপট কে জানে! এই একতম গানের পরে তাঁর আর কোনও গান কেউ তো শুনতে পায়নি। চলচ্চিত্রের নেপথ্য গায়িকা বলে শুধু নয়, বেসিক রেকর্ডেও তাঁর কণ্ঠ আর কেউ কি শুনবেন? তাঁর গান পরিবেশনের ধারাবাহিকতা বা ক্রমোন্নতির খবর কেউ কি জানেন? কোথা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সুরের জহুরি সুজাতাকে খুঁজে বার করলেন অথচ ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁকে সুযোগ দিলেন না কেন, সেটাও রয়ে গেল গভীর এক রহস্য হয়ে।

এমনতর বিস্ময়বার্তা স্মৃতিতে উঠে এল, যখন জানতে পারলাম বনশ্রী সেনগুপ্ত হঠাৎ প্রয়াত হয়েছেন। চারিদিকে যে সহসা কোনও শূন্যতাবোধের আর্ত হাহাকার জেগে উঠল তাও নয়। কেন না, বনশ্রীর তেমন গ্ল্যামার ছিল না, প্রচারের আলো তাঁকে কোনওদিন উজ্জ্বল করেনি। সিনেমা সূত্রে তাঁর কোনও গান জনাদরে ব্যাপ্ত হয়নি—এমনকি পারিবারিকতার গণ্ডি পেরিয়ে তাঁকে নিয়ে কোনও মিথ বা আমিষ কাহিনি কেউ শোনেনি। বরং কান পেতে শুনলে তাঁর গাওয়া চমৎকার একটা গান মনকে টানে। সেখানে বলার কথা ছিল—

একদিন সেইদিন সঙ্গীবিহীন পথে চলে যেতে হবে,
একদিন সেইদিন ক্লান্তিবিহীন স্রোতে ভেসে যেতে হবে।
কী হবে ভেবে কী হবে কী না-হবে

কী হবে চেয়ে কী রবে না-রবে
জানি না কী হারাবে কবে।

সঙ্গীবিহীন সেই অনিবারণীয় পথেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন ষাটোত্তীর্ণ বয়সে, তেমন কোনও শোরগোল শোনা গেল না। অথচ বনশ্রীর সংগীত সাধনার ভিত ছিল পাকা। কণ্ঠ ছিল সুরেলা আর মার্জিত। গানের পরিবেশনে কোনও মাস্টারিয়ানা ছিল না। দাপটে গান গাইতেন। কিন্তু তেমন তো সমাদর পেলেন না। তাঁকে পেশাদার শিল্পী হিসেবে প্রথম সারিতে কেউ রাখেনি। অথচ, তাঁর বেশ কটি গান নিষ্ঠা ও আবেগে ভরপুর। তার থেকে একটা গান বেছে এখন আমার চিরায়ত বাংলা বেসিক রেকর্ড গানের ঝাঁপিতে রাখব। তার মর্ম বুঝতে দেখে নেব কেমন সে গান। প্রথমেই আছে চমকের ঝিলিক, যথা—

আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম—
রঙিন খামে যত্নে লেখা আমারই নাম।

আশ্চর্য স্মৃতিগন্ধা গান, কেন না এককালে সত্যিই তে দু'বেলা চিঠি বিলি হত, তাই বিকেলের ডাক ছিল বেশ রোমাঞ্চভরা কেন না, তার পিঠেপিঠি যে নেমে আসবে সোনালি সন্ধ্যার মধুর মগ্নতা। হায়, এখন আর চিঠি আসে না রঙিন খামে, যাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকত প্রাপকের নাম। প্রেরকের হাতের লেখা থেকে অনুমান করতে হত কে সে! কিংবা হয়তো অনুমান করাই যেত না—সেটাও তো এক খেলা। গানে এবারে বলা হচ্ছে পত্রপ্রাপ্তির স্থান ও সময়, যেমন—

বসে ছিলাম একা ছাতিমবনে
রোদ ছিটানো শান্তিনিকেতনে—
তোমার চিঠি ছোট্ট পাখি হয়ে উড়ে এসে বলল—
আমি এই তো এলাম।

এ তো তাহলে প্রার্থিতের চিঠি এবং যথাস্থানে অর্থাৎ নিসর্গের শ্যামল প্রান্তরে, বৃক্ষতলে। গান শুনে শ্রোতার মনে জাগে কৌতূহল। কী আছে সেই পাখির মতো ভাসমান চিঠির বয়ানে? জানা গেল—

গন্ধমাখা মিষ্টি চিঠিটাতে ছোট্ট ক'টি লেখা—
'কেমন আছ তুমি?'
সেইটুকুতেই শুকনো মরা ডালে
ফুল ফুটিয়ে দিল দুরন্ত মৌসুমী।

এত ভালোবাসা ভরা গানখানি লিখেছিলেন তত-জানা-নয় গীতিকার শ্যামল ঘোষ। সুর করেছিলেন অন্যবর্গের নিপুণ সুরকার প্রবীর মজুমদার। দুজনের যৌথ রচনায় সমৃদ্ধ গানে বনশ্রী সপ্রাণ গায়নে বলে ওঠেন—

ভালবাসার এই যে ছোট্ট পাখি
আনল বয়ে খুশির রাঙা রাখি,
আমার মণিবন্ধে বেঁধে তাকে সুখের গাঙে
আপনাকে আজ ভাসিয়ে দিলাম।

সামান্য আয়োজনের আন্তরিকতায় ভরা এমন গানজাগানিয়া চিঠি, এখন এই মুঠোফোনের যুগে জন্মাবে কী করে?

## ॥ আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে ॥

বৃহত্তর বাংলা আর অসম বহুদিন থেকে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ। তবে ভৌগোলিকভাবে কিছু দুর্গম। করিমগঞ্জ আর শিলচরে গিয়ে বেশ কবার দেখে এসেছি পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট থেকে আসা প্রচুর বাঙালি—যাঁরা দেশভাগের পরে এসে পুনর্বসতি করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছি, সুর্মা-নদী আর বরাক উপত্যকার মহান উত্তরাধিকারী বলে তাঁরা খুব গর্বিত। সিলেটের সঙ্গে বাংলা গানের যোগ যথেষ্ট প্রগাঢ়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরি ও দিনেন্দ্র চৌধুরি ওখানকার সন্তান কিন্তু তাঁদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা কলকাতায়। অসমের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনে জীবন দান করেছেন।

তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অসমিয়া গানের প্রথম অভিঘাত ঘটে অন্তত বাষট্টি বছর আগে, ১৯৫৬ সালে, কলকাতার নিজাম প্যালেসে, যেখানে প্রথম শুনি ভূপেন হাজারিকার উদাত্তকণ্ঠে 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত'। প্রথমে খোদ অসমিয়া ভাষায়, তার গায়ে গায়ে বাংলা রূপান্তরে। আমূল চমকে যাই সেই গানের সুরস্বাতন্ত্র্যে ও গায়নে। তখন কলকাতায় পরাক্রান্তভাবে চলছে আধুনিক বাংলা গানের বিপুল তাণ্ডব। যাঁদের এখন বিজ্ঞাপনী ভাষায় বলা হয় স্বর্ণযুগের শিল্পী, তখন তাঁরা ব্যাপকভাবে ক্রিয়াপর। তার মাঝখানে তিনজন গায়ক কলকাতায় এসে শ্রোতাদের পাগল করে দিলেন তিনরকম গানে। প্রথমজন নির্মলেন্দু চৌধুরি তাঁর সিলেটি লোকসংগীত ও ভাওয়াইয়ায়। দ্বিতীয়জন বীরভূমের বাউল গানে পূর্ণদাস, আর তৃতীয়জন ভূপেন হাজারিকা। এঁদের তিনজনের কণ্ঠ যেমন উদাত্ত তেমনই সুরসমৃদ্ধ। এঁদের মধ্যে নির্মলেন্দু আর ভূপেন উঠে এসেছিলেন গণসংগীতের পরম্পরাসিক্ত হয়ে—জনতার সৌহার্দ্যে ও সখ্যে। অচিরে ভূপেন সুরকার ও গায়ক হিসেবে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন বাংলা ও অসম প্লাবিত করে বলিউডে গিয়ে। সেই সুবাদে শেষ পর্যন্ত তিনি অর্জন করেন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।

কিন্তু তাঁর কাছে এক মস্ত পাওনা এটাই যে অসমের অসামান্য এক গায়িকাকে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যাঁর নাম প্রতিমা বড়ুয়া, গৌরীপুরের রাজকন্যা অথচ সারাজীবন যিনি গেয়ে গেছেন নানাবর্গের অজানা অশ্রুত ঐতিহ্যের লোকায়ত গান। ভূপেন হাজারিকা ১৯৫৯ সালে একটি ফিল্মে ('মাহুত বন্ধু রে') প্রথম গান গাওয়ান প্রতিমাকে দিয়ে। সে গানের বিষয়, বাণী আর সুর যেমন একেবারে অন্যরকম, তেমনই তার নস্টালজিক গায়ন। সবাই আশ্চর্য এক মুগ্ধতা ও মোহে শুনলেন :

> আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে।
> হস্তী নড়ান হস্তীরে চরান কেকোয়া বাঁশের তলে,
> 'কি ওরে—কি কালসর্পে দংশিল মাহুতক কয়য়া যাও বা মোরে রে।'

এই এক গানে বাজিমাত আর প্রতিমা বড়ুয়ার প্রতিষ্ঠাবেদি রচনার সূচনা। অসমিয়া ভাষায় ও বিন্যাসে বোনা এমন অভিনব গানে ও সুরে ধরা আছে গহন জঙ্গলাকীর্ণ অসমের অবতলের আরণ্য

সংস্কৃতি আর হস্তীসংকুল সেই প্রত্যন্ত জনপদের নারীর অতলান্ত কান্না, যা স্ফুরিত হয়েছে প্রেমিক কোনও ভিনদেশি মাহুতকে নিয়ে। এ যেন প্রকৃতই হস্তীর কন্যার গান।

পালে পালে হাতি আর মহিষের দল নিয়ে যাদের জীবন আর জীবিকা, অরণ্যে প্রান্তরে প্রাকৃতিকতার বেষ্টনীর মধ্যে সেই মাহুত আর মহিষালদের সঙ্গে বন্য নারীর প্রণয়ের বৃত্তান্ত নগরজীবী সভ্য মানুষ কী করে জানবে? কিন্তু অনেক প্রযত্নে আর জঙ্গলবাসের অভিজ্ঞতা থেকে সেই সব তরুণ-তরুণীর গোপন হৃদয়গাথা আহরণ করে এনে প্রতিমা বড়ুয়া বারে বারে শুনিয়েছেন, অথচ এমন কাজ তিনি না করতেও পারতেন, কেননা জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত রাজপরিবারের মেয়ে। গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্রের পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রমথেশচন্দ্র ছিলেন বাংলা সিনেমার অগ্রপথিক। চতুর্থ সন্তান প্রকৃতীশ (লালজি) ছিলেন পেশাদার হাতিশিকারি—তাঁর বড়ো মেয়ে প্রতিমা। বাবার সঙ্গে জঙ্গলে হাতিশিকারের ক্যাম্পে গিয়ে মাহুতদের কাছ থেকে সরাসরি গোয়ালপাড়ার লৌকিক গান শিখে নিতেন প্রতিমা। তার একটি অনবদ্য নমুনা, এই চমকপ্রদ গানটি, যাতে আছে বাঁশবনে হঠাৎ সাপের কামড়ে বিবশ প্রায় বেহুঁশ এক মাহুতকে নিয়ে কন্যার আর্তি,

রোজায় ঝাড়ে গুনিনে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
কি ওরে—মুঞি নারী ঝারিম মাহুতকে ক্যাশের আগাল দিয়া রে।

সেকালে গ্রামীণ অসমে সর্পদ্রষ্ট ব্যক্তিকে রোজা বা গুনিনে এসে বাঁশের ডগা দিয়ে তুকতাক ঝাড়ফুঁক করত। কিন্তু মাহুতের প্রতি আসক্ত এই নারী জানাচ্ছে তার অভিলাষ হল নিজের চুলের ডগা স্পর্শ করিয়ে ঝাড়ফুঁক করার। দেখা যাচ্ছে নারীর বাসনা ক্রমে ক্রমে মাহুত বন্ধুর নিরাময়-পর্ব ধরে হয়ে ওঠে প্রশ্নাকুল। সে জানতে চায়, খাটাখুটো মাহুত রে তোর মুখে চাপদাড়ি কি ওরে—সত্য করিয়া কন রে মাহুত কোন বা দ্যাশে বাড়ি রে?

আখ্যান যত এগোয় ততই গানে গানে গাঁথা হতে থাকে এক নারী-পুরুষের সম্পর্কের রহস্যকথা। বিদেশ থেকে আসা অচেনা এই মাহুত বেশ কর্মক্ষম আর তার আছে মানানসই যুবজনোচিত চাপদাড়ি। তাকে দেখে কন্যার মনে জেগেছে বিহ্বলতা আর আবেগ, তাই জানতে চাইছে ভালোলাগা মানুষটির সাকিন। মানুষটিও তাতে সাড়া দিয়ে অকপটে জানায়—

হস্তী নড়াই হস্তীরে চরাই হস্তীর পায়ে বেড়ি, কি ওরে—
সত্য কইরা কইলাম কন্যা গৌরীপুরে বাড়ি রে।

সরল স্বীকারোক্তি যে, আমি হাতি নাড়াঘাটা করি, হাতি চরানোই আমার বৃত্তি। আর গভীর গহন বনেজঙ্গলে গিয়ে দৃপ্ত সাহসে মদমত্ত হাতির পায়ে বেড়ি পরিয়ে বশ করতেও পারি। আর আমার নিবাস? সেটা হল গৌরীপুরে।

নারীর কৌতূহল বা সন্দেহ তাতে পুরোপুরি কাটে না—কেননা সে যে আপন ভাগ্যকে জড়াতে চায় এই যুবকের জীবনের সঙ্গে। নারীসুলভ তার স্বাভাবিক সংশয়ী প্রশ্ন :

হস্তী নড়ান হস্তীরে চরান হস্তীর পায়ে বেড়ি, কি ওরে—
সত্য করিয়া কন রে মাহুত ঘরে কয়জন নারী রে?

যুবকের উত্তর হল,

হস্তী নড়াই হস্তীরে চরাই হস্তীর গলায় দড়ি, কি ওরে—
সত্য করিয়া কই হে কন্যা বিয়াও নাহি করি রে।

বাঃ বেশ। শ্রোতারা ভারী পরিতৃপ্ত। চমৎকার এক গ্রাম্য ব্যালাড—রচনাশৈলীটিও কী সুন্দর! সবাই খুশি।

# ॥ আমরা নূতন যৌবনেরই দূত ॥

আধুনিক বাংলা বেসিক গান, যা বহুকাল ধরে সংগীতামোদী বাঙালি শ্রোতারা শুনে চলেছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে আর রেডিওতে, তার বাণী বা ভাবভাবনার মধ্যে সবসময়ের গড় মানুষের মনের চেহারা পাওয়া যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলা গানে প্রেম একটা জনপ্রিয় বিষয়। সেই প্রেমে শুধু মিলনের মদিরা মেশানো নেই, আছে প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা ও বিরহাতুর বেদনা। এই দেশের গড় বাঙালি একদা শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়ে শুধু বিমুগ্ধ নয়, একেবারে হাবুডুবু খেয়েছিল। ব্যর্থ প্রেমিকের আর্কিটাইপ বলতে আমরা বহুদিন দেবদাসকে বুঝে নিয়েছি। মনোনীতাকে না পেয়ে মাদকে নিজেকে ডুবিয়ে, বিস্রস্ত কেশপাশ, মলিন বসনে আর্ত তার করুণ চেহারা আমাদের কেন যেন বড়ো ভালো লেগে গিয়েছিল। বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়, আশাবাদ কিংবা আত্মচেতন ব্যক্তিত্ব কি বাঙালি ভালোবাসে না? আশ্চর্য যে সেকালের বাংলা গানেও সেই হতাশা, মুমূর্ষা আর কারুণ্যের ভাষা ভর করেছিল। যেমন তখনকার একটা জনাদৃত গান মনে পড়ল:

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে
তোমারে করেছে রানী।

দারুণ অভিমানে প্রেমিক পুরুষ তার নারীকে বলছে আরেক গানে,

আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে
লিখো না আমার নাম।

আরেক অভিমানী প্রেমিকাকে বিনতি করে বলছে,

যদি ডাকো ওপার হতে এই আমি আর ফিরবে না।

ভাবলে বিমূঢ় লাগে যে, ব্যাপারখানা কী? কেন এত মরণকামনা? কেন এত স্মৃতিধার্য হওয়ার সাধ? তবে কি যৌবন আমাদের কোনও উদ্দীপনা, সংকল্প আর ভবিষ্যস্বপ্নে উদ্বেল করতে পারে না? এমন ধূসর ম্লান ক্ষণবাদের পটে অথচ বিদ্যুতের মতো দীপ্ত হয়ে থাকে একটা উজ্জীবনী গান এবং লেখাবাহুল্য যে সেটি চিরযুবা ও চিরজীবী রবীন্দ্রনাথেরই অমোঘ রচনা, যার ধরতাইতেই জেগে ওঠে এমন ঝঙ্কৃত উজ্জ্বল উচ্চারণ যে,

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।

গানটার রচনাগত ইতিহাস খোঁজ করতে গিয়ে জানছি এর সৃষ্টি ১৩৪০ বাংলা সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সের। গানটি তিনি রচনা করেন 'তাসের দেশ' নাটকের প্রয়োজনে। সেই সঙ্গে এই তথ্যটুকুও জেনে নেওয়া যায় যে, 'তাসের দেশ' নাট্যটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন বাংলার যুবশক্তির চিরতরুণ অধিনেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে।

দেশের মরা গাঙে বান ডাকাবার জন্য তো রুগ্‌ন আতুর প্রণয়ভঙ্গের বাণী তত প্রাসঙ্গিক থাকে না। তাই ভীরু শঙ্কিত পরপদানত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে এমন জাগরণের বাণীবহুল গান